ইসলামী সাহিত্য
মূল্যবোধ ও উপাদান

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী সাহিত্য
মূল্যবোধ ও উপাদান

আবদুল মান্নান তালিব

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান
আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৮৪

দ্বিতীয় প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯১

তৃতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৭

বাসাপপ্র ১

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রক
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ৫০ টাকা মাত্র

ISLAMI SAHITTA MULLOBODH O UPADAN
Written by **Abdul Mannan Talib.**
Published by Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Magh Bazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 01711581255

Price Tk.50.00 Only.

আমাদের প্রকাশিত বই

ইসলামী সাহিত্য

মূল্যবোধ ও উপাদান/ আবদুল মান্নান তালিব

অরণ্যে অরুনোদয়/জামেদ আলী

লাল শাড়ী/জামেদ আলী

মুনীরা/জামেদ আলী

কবি সাহাবা লবীদ/আব্দুস সাত্তার

নির্বাচিত গল্প (প্রথম খন্ড)/ আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত

বখতিয়ারের ঘোড়া/আল মাহমুদ

আল্লাহর পথের সৈনিক/নাজিব কিলানী

সাইমুম সিরিজ/আবুল আসাদ (১ থেকে ১২)

প্রসঙ্গ কথা

মুসলমানরা যা কিছু লেখে তাই ইসলামী সাহিত্য বলে অনেকের ধারণা। আবার ধর্মীয় বিষয়ে যা কিছু লেখা হয় সেগুলোকেও অনেকে ইসলামী সাহিত্য মনে করেন। ইসলামকে একটি ধর্ম মাত্র মনে করার কারণে দ্বিতীয় ধারণাটি এসেছে। আর মুসলমানের লেখা যদি ইসলামের উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে জানিনা কে তাকে ইসলামী সাহিত্য আখ্যা দেবার সাহস করবে?

তাই ইসলামী সাহিত্য যথার্থই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ- তেমনি ইসলামী সাহিত্যও একটি বিশ্বজনীন সাহিত্য। ত্রয়োদশ শতকে আমাদের এদেশে মুসলমানরা যখন প্রথম ইসলামী সমাজের গোড়া পত্তন করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের আদর্শকেই তারা গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস তারা চালিয়েছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। এর প্রথম প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের মানবতাবাদকে তারা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ফলে দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষ হয়ে উঠেছিল সে সাহিত্যের বিষয়বস্তু। এভাবেই আমরা দেখি ইসলাম যে দেশেই বিস্তার লাভ করেছে সে দেশের সমাজ, সভ্যতা, জীবন ব্যবস্থার সাথে সাথে সাহিত্যের ওপরও পড়েছে তার সুগভীর প্রভাব। কোনো বিষয়ে ইসলামের একটি আদর্শকে গ্রহণ করা আর ইসলামের সার্বিক মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে কোনো বিষয় গড়ে তোলার মধ্যে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এখানে এই দ্বিতীয়টাই আমাদের আলোচ্য।

বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিকেই আমরা লক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছি। সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া এদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা সম্ভবপর নয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যেমন সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণের বার্তাবহ তেমনি ইসলামী সাহিত্যও মানবতার আশা আকাংখা পূরণের যথার্থ ধারক। ইসলামী সাহিত্য মানুষের সমাজকে কল্যাণ ও সফলতায় ভরে দেয়। বোধ হয় মানুষের প্রত্যেকটা কাজের উদ্দেশ্য কল্যাণ ও সফলতা অর্জন। নিজের অকল্যাণ ও ব্যর্থতা ডেকে আনার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই মানুষ কোনো কাজ করে না। আশা করি একথা সবাই স্বীকার করবেন। কাজেই সাহিত্য ক্ষেত্রে অকল্যাণ ও ব্যর্থতার প্রতিষ্ঠাকে আমরা উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। সাহিত্য মানবতার জন্য, সাহিত্য জীবনের জন্য, সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের জন্য। ইসলামী সাহিত্যের এটিই হচ্ছে মৌল পরিচয়। মানুষের সমাজ গড়ায় সাহিত্যের যতটুকু অংশ রয়েছে তা তার এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের সাথে বিজড়িত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মুসলমানরা বিপুল সাহিত্য সম্ভার গড়ে তুলেছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বড় বড় মুসলিম সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য ইসলামী সাহিত্যের জন্য বিপুল প্রেরণার উৎস। তাঁদের মধ্য থেকে যাঁরা ইসলামী মতাদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধকে নিজেদের সাহিত্য কর্মের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁরাই আমাদের আদর্শ।

বিগত আট ন'শো বছর থেকে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে মুসলমানদের পদচারণা। বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে মুসলমানদের সৃষ্টি সম্ভারও কম নয়। কিন্তু তাদের রচনার একটি বিরাট অংশ ভিন্ন মতবাদ আশ্রিত। বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিম সাহিত্যিকদের বৃহত্তর অংশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের এগিয়ে না আসারই কথা। তাই অপেক্ষাকৃত তরুণ তাজাদের মধ্যে এ আগ্রহটা দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক কালে। ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একদল বিশ্বাসী তরুণ এগিয়ে এসেছেন। প্রবীণদের কিছু সংখ্যক মাথাও তাদের মধ্যে গণনা করার মতো।

তাদেরই অনুরোধে ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কিত এ আলোচনাটির অবতারণা। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে তৎপর সাহিত্য সংগঠন বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাধারণ সাহিত্য সভায় ১৯৮৩ সালের জুন মাসে প্রবন্ধটি পড়ে শুনানো হয়। বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বের জন্য অনেকেই আলোচনাটির ব্যাপক প্রচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলা সাহিত্য পরিষদ যথাসময়ে এর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে লেখককে দায়মুক্ত করেছেন এ জন্য পরিষদ কর্তৃপক্ষকে অবশ্য ধন্যবাদ জানাতে হয়।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা

জীবন ও জগতের সম্পর্ক

আমরা প্রথম চোখ মেলি পৃথিবীর কোলে। পৃথিবীর আলো বাতাসে আমাদের প্রাণ স্পন্দিত হয়। এর খাদ্য শস্য ফলমূলে দেহ পরিপুষ্ট হয়। জীবনে জোয়ার আসে। জীবনের নৌকা ভেসে চলে গভীর পানিতে। আমাদের চারপাশের এই পৃথিবী, আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার, প্রকৃতি-পরিবেশ সবটা নিয়ে আমাদের জগত। আমাদের চিন্তা ভাবনা, আশা-আকাংখা, আগ্রহ-অনাগ্রহ তার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যতক্ষণ আমরা এই জগতের বুকে আছি ততক্ষণ। যখনই চোখ দু'টি মুদে জগতের বুক থেকে বিদায় নিই মুহূর্তেই সেই দূরন্ত ছুটন্ত ঘোড়া উধাও হয়।

আমাদের জীবন আমাদের জগতের সাথে এক সূতোয় বাঁধা। একটা টানলে আরটা আসে, আরটা টানলে অন্যটা আসে। জীবন শেষ হয়ে গেলে মনে হয় জগতও বুঝি নেই। আবার জগতের যেদিন শেষ মুহূর্ত ঘোষিত হবে সেদিন জীবনেরও বিলোপ ঘটবে। কল্পনার পাখায় ভর করে আমরা জগতের সীমানাও পেরিয়ে যাই। কিন্তু চৈতন্য ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই কল্পনার পাখিটি দূম করে আছড়ে পড়ে জগতের বুকে। জগতের সূতোয় আমাদের জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। একটু নড়াচড়া করে পটপট করে যে এই সূতোগুলো ছিঁড়বো সে আশায়ও গুড়ে বালি।

যতদিন জগতের বুকে থাকি আমরা কাজ করে যাই। ভালো মন্দ সব রকম কাজ আমরা করি। জগতটা যেন যন্ত্র আমরা তার চালক। এই যন্ত্রে হাত রাখলেই তার চাকা ঘুরতে থাকে। পেছনের দিকে ঘুরুক বা সামনের দিকে ঘুরুক, এদিকে ঘুরুক বা ওদিকে ঘুরুক, তা ঘুরতেই থাকে, অনবরত ঘুরতে থাকে। অথবা আমরা যেন যন্ত্র আর জগতটা তার চালক। যে রকম ইচ্ছে সে আমাদের চাকা ঘুরাতে থাকে। তার দরবারে করুণার আর্জি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তখন আমাদের আর কোন উপায় থাকে না। এ অবস্থায় আমরা হয়ে পড়ি মানবেতর। মহত কিছু সৃষ্টি, বৃহত কিছু করা আমাদের পক্ষে

সম্ভব হয় না। আমাদের সৃষ্টি আমাদের কাজ তাই কালে আমাদের বা আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। আর জগতকে যখন আমরা বশ করি, কাজে লাগাই তখন আমাদের সৃষ্টি হয়ে ওঠে মহত্তর, কালোত্তীর্ণ। আমরা জগত থেকে বিদায় নিই। কিন্তু আমাদের সৃষ্টি থেকে যায় আমাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর হয়ে।

জগতের সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক কি তা মনে হয় এই আলোচনা থেকে অনেকটা খোলসা হয়ে গেছে। এখন এই জীবন ও জগতের উদ্দেশ্য জানতে হবে। তবে তার আগে জীবন ও জগতের স্রষ্টা কে তা অবশ্য জানা প্রয়োজন।

স্রষ্টা কে?

স্রষ্টা আছে কি নেই এ বিতর্কে না গিয়ে আমরা এখানে এক পক্ষ নিচ্ছি, যেহেতু এ বিতর্ক আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা মানি আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি জীবন ও জগত সৃষ্টি করেছেন। যা কিছু দৃশ্য, অদৃশ্য, বর্তমান, ভবিষ্যত, যা কিছু কালের গর্ভে নিহিত, যা কিছু কালের অতীত, কল্পনায় যা ধরা দেয় এবং যা অকল্পনীয়- সে সব বস্তু, শক্তি এবং অন্যান্য সব কিছু তাঁরি সৃষ্টি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর একান্ত অনুগত হিসাবে। তিনি নিজেই বলেছেনঃ ওয়া খালাকা কুল্লা শাই্ইন ফাকাদ্দারাহু তাকদীরা- আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আবার সবার জন্য একটা বিশেষ পরিমাপ ঠিক করেছেন। এর মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সৃষ্টির বুকে সম্ভাবনাও তিনিই নিহিত রেখেছেন। সৃষ্টি তার সম্ভাবনার স্রষ্টা নয়, তার বিকাশ সাধন করে মাত্র।

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

জগত ও জীবনের স্রষ্টা আমাদের এমনি সৃষ্টি করেছেন? না আমাদের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে কোন উদ্দেশ্য? আমরা যখন সামান্য, খুব ছোট একটা

জিনিস তৈরী করি, সেখানে আমাদের একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকেই। তাকে আমরা কোন না কোন কাজে লাগাই। তাহলে বস্তু–অবস্তু নির্বিশেষে বিশাল জগতের মহান স্রষ্টা আমাদের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, এটা কেমন করে হতে পারে? আমাদের দিয়ে তিনি কোনো কাজ করতে চাননা, এটা কি কখনো কল্পনাও করা যায়? জগতের বুকে আমাদের টিকে থাকার ও কাজ করার যাবতীয় উপকরণ তিনি আমাদের এখানে আসার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আগে তৈরী করেছেন।

এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে এই উপকরণগুলোকে কেবল আমাদের উপযোগী করেছেন। এত কিছু সাজ–সরঞ্জাম, যোগাড়যন্ত্র করে তিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন। আর এ সৃষ্টির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, এটা কেমন করে বলা যায়? একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষই কেবল এ সত্যটি অস্বীকার করতে পারে। আর যদি এখানে সৃষ্টাকে স্বীকারই না করা হয় তাহলে বিশ্ব জগতের এই সব সাজ সরঞ্জামের যেকোনো ব্যাখ্যাই এখানে অচল।

আমাদের সৃষ্টির প্রথম দিনে স্রষ্টা সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিলঃ ইন্নী জা–'ইলুন ফিল্ আরদি খলীফাহ– 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই।' অর্থাৎ মানুষকে দেখতে চান তিনি নিজের প্রতিনিধি হিসাবে। আর আল্লার প্রতিনিধি হতে হলে মানুষকে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে আল্লার গুণাবলী। মানুষকে হতে হবে আল্লার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। আর দ্বিতীয়ত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের অপরিহার্য অংশ হিসাবে সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক যেসব নীতি–নিয়ম, আইন–কাননু তৈরী করেছেন, সেগুলো তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে সেই নিয়ম ও আইন অনুযায়ী চালাতে হবে, মানুষের সমাজে সেই আইনের প্রচলন করতে হবে। দুনিয়া থেকে ফিতনা ফাসাদ দূর করে শান্তি শৃংখলা ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বোপরি আল্লার হুকুম পুরোপুরি মেনে চলে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে এই জীবনের মূল লক্ষ। জীবনের যাত্রা এ জগতেই শেষ হয়ে যায় না। বরং এটা তো সাময়িক জীবন। আসল জীবন শুরু হবে এর পর থেকে। জীবনের এই পরীক্ষাগার থেকে বের হয়ে মানুষ তখন তার প্রকৃত স্রষ্টা, মালিক, মাবুদ, প্রভূ, প্রতিপালক আল্লার দরবারে হাজির হয়ে যাবে।

আল্লার দরবারে হাজির হবার সময় দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃত্ব-ক্ষমতা মানুষের থেকে বিদায় নেবে। সে হবে দস্তুরমতো একজন আসামী। সেখানে তাকে তার দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। চুলচেরা হিসাব। দুনিয়ায় তাকে যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করা হয়েছিল তাকে সে কিভাবে ব্যবহার করেছে? প্রতিনিধিত্বের হক সে পুরোপুরি আদায় করেছে কিনা? না কি পথের নেশায় মেতে সে তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে গেছে এবং এই সাময়িক জীবনটাকে সম্পুর্ণ ও চুড়ান্ত মনে করে জীবনটা শুধু উপভোগই করে গেছে-এ ব্যাপারে তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের কোন পরোয়াই সে করেনি?

প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের বোঝা মানুষ নিজেই একদিন কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এ বোঝা বইতে আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় অস্বীকার করেছিল। তারা এর গুরুভার উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বুদ্ধিমান মানুষ সেই গুরুদায়িত্ব ঠিকমত পালন করে আল্লার সামনে সফলকাম হবার চেষ্টা করবে।

এ দুনিয়ায় আমাদের একটা বিশেষ মর্যাদা ও দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের নিজেদের এই দায়িত্ব ও মর্যাদা অনুভব করতে হবে। আমাদের জীবনের সমগ্র কর্মনীতি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে আমরা সকল অবস্থায় এগিয়ে যেতে পারি। আর জীবনের সকল বিভাগে মহান-আল্লাহ কুরআন মজীদ ও রসূলের আদর্শের আবরণে আমাদের যে বিধান ও নীতি পদ্ধতি দান করেছেন সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আল্লার বিধানের অনুসারী প্রত্যেকটি কাজই আমাদের জন্য কল্যাণকর। যে সব কাজ দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎ বৃত্তির প্রসার ঘটায় এবং অসৎ বৃত্তি ও মন্দকে অন্ধকারের অতলে ঠেলে দেয় আর যা আমাদের দীন ও দুনিয়ার সাফল্য এবং পরকালীন মুক্তিলাভের পথ দেখায়, তাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। দুনিয়ার সাথে সাথে দীনী উন্নতিরও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দুনিয়ার সাথে সাথে দীনী সাফল্য অর্জনের জন্যও দোয়া করতে বলেছেন। দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ এবং দুনিয়ায় সাফল্য ও আখেরাতে সাফল্য আমাদের কাম্য। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়ার সাফল্য কামনা করে তার তো ক্ষতির শেষ নেই। তবে দুনিয়ার সাফল্য ও দুনিয়ার

কল্যাণ লাভ করার আকাংখাকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে একথা ঠিক এবং এজন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করাকে পছন্দ করা হয়নি। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংসারত্যাগী বৈরাগী দরবেশী জীবন যদি অকাংখিত হতো তাহলে কুরআন ও হাদীসে সামাজিক ব্যবস্থাপনার নীতি-নিয়ম, আইন-কানুন ও অনুশাসন দান করার এবং এর আওতায় বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ বিধান জারী করার প্রয়োজন হতো না। সমগ্র কুরআন ও হাদীসে সংসারত্যাগী জীবনের কোনো বিধানই নেই। বিপরীতপক্ষে সেখানে আমাদের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী রয়েছে। আমাদের জীবনের সম্ভাব্য এমন কোন দিকই নেই যার জন্য কোনো বিধান ও নীতি-নিয়ম সরবরাহ করা হয়নি। তাই কুরআন মজীদ আমাদের কাছে দাবী জানায়- তোমাদের সমগ্র জীবন ইসলামের হাতে সোপর্দ করে দাওঃ উদখুলু ফিস্ সিল্মি কা-ফ্ফাহ- ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো পুরোপুরি। কুরআনে আরো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা হয়েছেঃ "তোমরা কি কুরআনের একটা অংশ মেনে নেবে আর একটা অংশ মেনে নেবে না? যারা এহেন আচরণ করবে তারা এই দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে এবং আখেরাতে কঠিনতম শাস্তির সম্মুখীন হবে।" তাই আকিদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে একজন মুসলমান তার সাহিত্যিক জীবনকে ইসলামী বিধান ও ইসলাম প্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন রাখতে বাধ্য। মুসলমানের জীবনে সাহিত্য চর্চার যে অংশ রয়েছে তা পুরোপুরি ইসলামী বিধানের অনুসারী হবে।

এখানে আমরা শুধু মুসলমানের কথা বলছি। আচ্ছা, যদি সমস্ত মানুষের কথাই বলি তাহলেও কি এর মধ্যে কোনো বড় রকমের ফারাক দেখা যাবে? প্রত্যেকটি মানুষই আস্তিক হোক বা নাস্তিক কোনো না কোনো বিশ্বাসের অনুসারী। আর এই বিশ্বাস অনুযায়ী সে তার সমস্ত কাজ করে যায়। তবে কিছু লোক আছেন তারা কোনো স্থির বিশ্বাসী নন। বুদ্ধি বিবেককে খোলা ছেড়ে দেন। উপস্থিত পছন্দ মতো বিশ্বাসের পেছনে গা ভাসিয়ে দেন। আমি বলবো, এরাও বিশ্বাস বিহীন নয়। বিশ্বাস বৈচিত্রই এদের বিশ্বাস। কাজেই জীবনকে তারা সেভাবেই গড়ে তোলে। তাই মুসলমান যেমন সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের অনুসারী তেমনি এই সব অমুসলিম আস্তিক ও নাস্তিক গোষ্ঠীও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও বিশ্বাস বৈচিত্রের

অনুসারী।

এখানে ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী সাহিত্য চর্চা করলে সংকীর্ণতা দুষ্ট হবার ভয়ও করা হয়। ব্যাপার হচ্ছে মুসলমানের যেমন জীবন আছে তেমনি অমুসলিম আস্তিক ও নাস্তিক এক জীবনের অধিকারী। তারা তাদের জীবন বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করলে এবং সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত হলে যদি তা সংকীর্ণতায় আবদ্ধ না হয় তাহলে ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার প্রশ্ন আসে কেন?

সাহিত্য কি?

হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য। বাইরের কোনো কিছু সূক্ষ্মভাবে অনুভব করার পর ব্যক্তি মাত্রই তা প্রকাশের আকাংখা পোষণ করে। সাহিত্যিক হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অনুভবকে অলংকার, রূপক, ছন্দ এবং ভাষা ও শব্দের কারুকার্জের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এভাবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক পারিপার্শ্বিকের সাথে নিজের সংযোগ স্থাপন করেন। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক নিবিড়। জীবনের মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সাহিত্য সবসময় সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই সাহিত্যিকের মন, সমাজ–পরিবেশ ও প্রকাশভংগী এই তিনটি বিষয়ই বিবেচনার যোগ্য। সাহিত্যিক যা কিছু প্রকাশ করেন তা কেবল তার আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নয়। বাইরের জিনিসকে তিনি নিজের মনের মত করে, নিজের মনের অনুভূতি দিয়ে নিবিড় করে, নিজের দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিশ্লেষণ করে হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করেন। সাহিত্যিক শুধু নিজের সাথে কথা বলেন না, তাকে পাঠকের সাথে কথা বলতে হয়। ফলে সাহিত্যিক যেমন একদিকে নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করেন, তেমনি অন্যদিকে পাঠকের চাহিদাও পূরণ করেন।

সাহিত্য আমাদের সমাজ–সভ্যতা সংস্কৃতির মান উন্নত করে। আমাদের চেতন–অবচেতন জগতের সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে আমাদের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে। সাহিত্য আমাদের সুখ–দুঃখ হাসি–কান্নার

সহযোগী হয়। গরীবের কুটীরে যেমন তার অবাধ যাতায়াত তেমনি ধনীর প্রাসাদের সকল দুয়ারও তার জন্য উন্মুক্ত। সাহিত্য আসলে আমাদের হৃদিস্পন্দনের প্রতিধ্বনি, শব্দের মনোরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্য একটি বিশ্বজনীন নিয়ম, একটি সর্বব্যাপী আইন, যা মানবিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। সাহিত্য শুধুমাত্র মনের কারিগরী নয় আবার শধুমাত্র বস্তুজগতের অনুরণনও নয়। সাহিত্য সভ্যতার নির্মাতা আবার সভ্যতার প্রাসাদও। একথা সবাই স্বীকার করেন যে, সমাজের প্রভাব সাহিত্যের ওপর পড়ে এবং সাহিত্যের প্রভাব পড়ে সমাজের ওপর। সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের শ্রেণী বিভাগ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক ঐতিহ্য, সমাজের বিশেষ আবেগ-অনুভূতি, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা-আকাংখা এসব কিছুই নিজেদের স্বাভাবিক ও বিশেষ পদ্ধতিতে আমাদের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

এ আলোচনা থেকে একটা কথা অন্তত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিছক আনন্দ দান করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। আবার নিছক শিল্পকারিতা বা সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য করাও (Art for Art's sake) সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্য সমাজের নিছক প্রতিচ্ছবিও নয়। সমাজের ঘটনা, ঐতিহাস, অনুভূতি, আশা-আকাংখা সাহিত্যে রূপায়িত হয় ঠিকই কিন্তু তা সাহিত্যিকের দৃষ্টি-ভংগী ও আবেগ-অনুভূতির জারক রসে সিঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যকে এই অর্থে জীবন সমালোচনা (Criticism-of life) বলা হয়। সাহিত্যকে জীবনের প্রতিনিধিও বলা যায়। কিন্তু তা এই অর্থে যে, সাহিত্যিক তার সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানগুলো বাইরের জগত থেকে সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে এ উপাদানগুলোর যথাযোগ্য নির্বাচনের ওপরই সাহিত্যের মূল্যায়ন নিরূপন নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে আসল গুরুত্বের অধিকারী হচ্ছে সাহিত্যিকের মানসিক কার্যক্রম, যা সে ঐ

উপাদানগুলো গ্রথিত করার ও সেগুলোকে উপযোগী শব্দের পোশাকে সজ্জিত করে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। সাহিত্যে ঘটনাবলীর একটা নির্জীব কাঠামোর কোনো গুরুত্ব নেই। বরং সাহিত্যিকের অনুভূতিশীল হৃদয় তার মধ্যে যে প্রাণ সঞ্চার করে সেটিই মৌল গুরুত্বের অধিকারী। এ প্রেক্ষিতে যদি বলা হয়, সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের মানসিক কাঠামোয় নির্মিত জীবনের একটি প্রাসাদ, তাহলে তাই বেশী নির্ভুল হবে বলে মনে হয়। ফরাসী দেশের একটি প্রবাদে বলা হয়ঃ শিল্পই জীবন। কিন্তু সেই শিল্পকে শিল্পীর আয়নায় দেখা যেতে পারে। একজন শিল্পী যে আবরণের আড়াল থেকে জীবনের আঙিনায় উঁকি মারে সেটি হচ্ছে তার নিজের ব্যক্তিত্ব। বলাবাহুল্য শিল্পীর ব্যক্তিত্ব কোনো নিষ্প্রাণ ক্যামেরা নয়। তার সাহায্যে জীবনের কোন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছবি তোলা সম্ভব নয়। একজন সাহিত্যিক যখন তার মনের পাতায় জীবনের ছবি আঁকে, তার সাথে তার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি ও ঝোঁকপ্রবণতা ব্যাপকভাবে মিশে যায়। কাজেই সাহিত্যিক যদি সমাজ থেকে তার সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তা আবার কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সাহিত্যের আকারে সমাজকে ফেরত দেন। শিল্পকারিতার ক্ষেত্রে এই নগদ লাভটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ।

মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যবিহীন কোনো বিষয়ের কথা কল্পনাই করা যায় না। সে উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে, ছোট হতে পারে, বড়ও হতে পারে। তেমনি সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য সাহিত্যের ওপর ছেয়ে গেলে চলবে না। তবে সাহিত্য উদ্দেশ্যের ওপর ছেয়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। সাহিত্যকে প্রপাগান্ডায় পরিণত করা কোনক্রমেই উচিত নয়। এদিক দিয়ে ইকবাল সাহিত্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইকবাল তাঁর কবিতায় এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ণ সাহিত্য রসে সিঞ্চিত, কিন্তু সাথে সাথে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহজ প্রকাশও তার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। যেমন তিনি গতি, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম প্রবণতাকে 'প্রেম' নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই প্রবণতা থেকে তাঁর কাব্যের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন 'শাহীন', 'ইকাব', 'কালিন্দর' ও 'মর্দে মুমিন' নামে। এই গতি ও পরিবর্তনপ্রিয়তা এবং দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম প্রবণতাই তাঁর সাহিত্যকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলেছে। যে সাহিত্যিক নিছক ব্যক্তিগত ভাব-কল্পলোকে বিচরণ করে,

যে প্রসারিত দৃষ্টির অধিকারী নয়, সমগ্র জীবনকে করতলগত করার মতো মতাদর্শ থেকে যে বঞ্চিত, জীবনের খন্ড খন্ড ঘটনাবলী, মানবিক কার্যক্রম ও খন্ডিত আবেগ–অনুভূতিকে একটি বিশ্বজনীন সত্যের ছাঁচে ঢালাই করার ক্ষমতা যার নেই, যে সমগ্র মানবতা ও তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা অধ্যয়নের ক্ষমতাই রাখে না, সে আসলে উদ্দেশ্য ও লক্ষাভিসারী সাহিত্য সৃষ্টির মহান দায়িত্ব থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ায়। তার দৃষ্টি কখনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঘুলঘুলিতে আটকে যায়। কখনো সে বিলাসিতার শুঁড়িখানায় হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকে। কখনো কোনো প্রেমিকার নরোম চুলের ভেতরে মুখ লুকিয়ে সে পারিপার্শ্বিককে ভুলে যায়। আবার কখনো হতাশার আফিম খেয়ে নিজেকেও ভুলিয়ে বসে। জীবন তাকে আহবান জানাতে থাকে। কর্তব্যের ডাক তার কানে ঘন্টার মতো বাজে। তার ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তিসত্বা তার হাত ধরে টানতে থাকে। মানবতা তার পেছনে কান্নার রোল তোলে। কিন্তু সে পড়ে থাকে নির্বিকার। অন্যদিকে আদর্শ ও লক্ষাভিসারী সাহিত্যিক ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দূর্দান্ত শিকারী বাজপাখীর মতো। হতাশা ও নৈরাশ্যকে গলা টিপে হত্যা করার এবং দুঃখ–শোক, অন্যায়–অকল্যাণ, ফিতনা–ফাসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর হয়ে প্রতিকূল পরিবেশের প্রাচীর ভেঙে নতুন দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য সে মানুষকে আহবান জানাতে থাকে।

ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট

সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়। প্রত্যেক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। তেমনি সমাজের সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যও কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী হয়। সে নিজের মধ্যে এমন কিছু ঐতিহ্য সৃষ্টি করে নেয় যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। একক পরিবেশ ও একক ঐতিহ্য এবং আকীদা–বিশ্বাসের একাত্মতা সব কিছু মিলে একটা বিশেষ ধরনের চিন্তাধারার জন্ম দেয়। বিশেষ চিন্তাধারা আবার একটা বিশেষ প্রকাশ ভংগীর উদ্ভব ঘটায়। অনেক সময় দেখা যায় বক্তব্য এক হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর চিন্তা করার, তাকে কার্যকর

করার, তার মধ্যে উত্থাপিত সমস্যাগুলো সমাধান করার এবং তার ফলাফল থেকে প্রভাব গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রত্যেক সমাজের আলাদা। মুসলমান ও তাদের সাহিত্যের ব্যাপারেও একথা সত্য। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা জীবনের সমস্ত নীতি–পদ্ধতির ওপর কর্তৃত্ব করে। সে দীন ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ইসলাম বিস্তারিত বিধান তৈরী করেছে। তার কাছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সে অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের জন্য যেমন আইন ও বিধান দেয় তেমনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্যও বিধান দিয়ে থাকে। ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনের আওতাধীনে মসজিদে যাবে, নামাজ পড়বে আবার বৈষয়িক জীবনে নেমে সূদের কারবার করবে, অন্যের জমি বেআইনীভাবে দখল করবে এবং সমাজ জীবনের আঙিনায় এসে অশ্লীল নাচ–গানের আসর বসাবে ও মদের নেশায় চুর হয়ে থাকবে আর এমন সাহিত্য সৃষ্টি করবে যা সমাজের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করে দেবে, ইসলাম কোনো ক্ষেত্রে এর অনুমতি দেয় না। এটা কেবল ইসলামের কথাই নয়, যে কোনো আইনের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলা হয়, তার কিছু দাবী থাকে, যে কোনো অবস্থায় সেগুলো পূরণ করিয়ে নেবার জন্য সে সচেষ্ট থাকে। কোনো বুদ্ধিমান সমাজ নিজেকে নৈরাজ্যের শিকার করতে চায় না। কাজেই ইসলামী সমাজও কোনো অবস্থায়ই মুসলমানদের ওপর এনার্কি ও নৈরাজ্য চাপিয়ে দিতে চায় না। যদি খোদা–না–খাস্তা কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তখন আমাদের জীবন আর স্বাভাবিক মানুষের তথা আশরাফুল মখলুকাতের জীবন থাকবে না। বরং সে জীবন তখন হয়ে দাঁড়াবে মানবেতর–'বাল হুম আদল'–বরং তার চাইতেও খারাপ। আমার মনে হয় এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা কোনো বিবেকবান ব্যক্তির কাম্য হতে পারে না। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চাইবেন তার জীবনের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ও বিধান। প্রত্যেকেই নিজের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের জন্য কোনো নীতি পদ্ধতি নির্ণয় করে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে নিতে চাইবেন। পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই সমগ্র আইন ও বিধানকেই নিজেদের একমাত্র ফায়সালাকারী হিসাবে মেনে নেবেন। ইসলাম কুরআনের আকারে আল্লার বিধানের একটি সংকলন মুসলমানদের দান

করেছে। এই বিধানগুলো এবং এই সঙ্গে রসূলের বাণীসমূহ ও তাঁর সুন্নাতই হচ্ছে মুসলমানদের জীবনের জন্য একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা। মুসলমান দুনিয়ার যেখানেই বাস করুক না কেন, এই বিধান ও সুন্নাতের সামনে অকপটে মাথা নত করে। জীবনের সব সমস্যার সমাধান তারা খোঁজে এরই মধ্যে। সব বিষয়ে তারা এখান থেকেই নেয় দিক নির্দেশনা।

কাজেই ইসলামী সাহিত্যও নিজেকে এই বিধানের আওতার বাইরে রাখতে পারে না। এর বাইরের কোনো মানদন্ড অন্যের কাছে যতই মূল্যবান হোক না কেন, ইসলামী সাহিত্যের কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। ইসলামী সাহিত্য জীবনের সমগ্র আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ ধরনের সাহিত্যকর্ম নয়। বরং সমগ্র জীবনের সাথে এর সমান সম্পর্ক। জীবনের সমস্ত বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারসাম্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিই এর কাজ।

ইসলামী সাহিত্য কি?

একটা অদৃশ্য মহান ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তার হাতে মানুষের প্রাণ। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। জগত তাঁরই সৃষ্টি। মানুষকে তিনি স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জগতের অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুকে তা দেননি। তাই মানুষ তার সমাজ সভ্যতা সৃষ্টি করে, গড়ে তোলে। তার রূপ আজ এক রকম, আগামীকাল অন্য রকম। অতীতে যেমনটি ছিল বর্তমানে তেমনটি নেই। অথবা তার সম্পর্কে বলা যায় যে, তার এরকম নয় ওরকম হওয়া উচিত। কিন্তু প্রাণী বা বস্তু জগতের বেলায় এ ধরনের কোনো কথা বা নীতি খাটে না। মানুষের সমাজ-সভ্যতার রূপ এই যা ছিল, যা আছে, যা হবে বা হওয়া উচিত তার সবটুকুই ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু। ইসলামী সাহিত্য জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর জীবন বলতে যা ছিল, যা হচ্ছে বা হবে এবং যা হওয়া উচিত সবগুলোই বুঝায়। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে ইসলাম যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যে সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো পত্র-পল্লবে শাখা-

প্রশাখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটিই ইসলামী সাহিত্য। জগত ও জীবনের অসংখ্য দিক রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য এই সব দিকের ওপর ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে। এ থেকে পরোক্ষভাবে একথাও প্রমাণ হয় যে, ইসলামী সাহিত্য একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষাভিসারী। জীবনের যেমন একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ রয়েছে ইসলামী সাহিত্যও তেমন একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে। তাহলে দেখা যায়, 'আর্ট ফর আর্টস সেক' ধরনের কোনো সাহিত্য যদি থেকেই থাকে তবে ইসলামী সাহিত্যে তার কোন স্থান নেই। আমাদের জীবন যদি উদ্দেশ্যবিহীন না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাহিত্য উদ্দেশ্যবিহীন হবে কেন? আমাদের জীবন যেমন কয়েকটা নিয়মের অধীন তেমনি আমাদের সাহিত্যও। ইসলামী সাহিত্যে ব্যাপকতা আছে, চিন্তা ও লেখার স্বাধীনতাও আছে। অন্য কোন সাহিত্যে এগুলো যে চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে ইসলামী সাহিত্যে তার অবকাশ নেই। অন্য সাহিত্য নিজেকে নৈতিক বোধ, বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-শৃংখলার উর্ধে রাখতে চায়। কিন্তু ইসলামী সাহিত্যে তা সম্ভব নয়।

একজন সচেতন মুসলিম, যে তার জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিস-ব্যবহারিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ইসলাম নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে, যার চলাফেরা, ওঠাবসা, লেন-দেন, কথা-বার্তা চিন্তা-ভাবনা সবকিছু ইসলামের গন্ডীর মধ্যে আবর্তিত হয়, সে কেমন করে কেবলমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে, কবিতা-গলপ-উপন্যাস-নাটক লেখার সময় একটি অনৈসলামী মতবাদের আওতাধীন হয়ে যাবে? তবে সাহিত্য তথা কবিতা ও গল্প ইসলামী হওয়া মানে নিশ্চয়ই কেউ একথা মনে করবেন না যে, তার মধ্যে অযু-গোসল ও নামাজ রোজার মাসলা-মাসায়েল থাকবে বা সেখানে হবে কেবল হামদ ও না'তের অবাধ রাজত্ব অথবা ধর্মের গুণকীর্তনই হবে সে সাহিত্য অঙ্গনের বিষয়বস্তু। বরং ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী গল্প ও ইসলামী কবিতা তাকেই বলা হবে যার মধ্যে জীবনের এমন সব নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে যেগুলোকে ইসলাম মানবতার জন্য কল্যাণপ্রদ গণ্য করেছে এবং যার মধ্যে এমন সব মতবাদের বিরোধিতা করা হবে যেগুলোকে ইসলাম মানবতার জন্য ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করেছে। কুরআন যে ধরনের মানুষ তৈরী ও যে ধরনের চরিত্র

গঠন করতে চায় ইসলামী কবিতা ও গল্প সেই ধরনের মানুষ তৈরী ও চরিত্র গঠনের উদ্যোগ নেয় এবং তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। আর কুরআন যে ধরনের মানুষকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে এবং যে ধরনের চরিত্রকে অনভিপ্রেত গণ্য করেছে ইসলামী কবিতায় ও গল্পে তার সম্ভাবনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। ইসলামী সাহিত্য তাকেই বলা হবে যা মানবতাকে নৈতিকতার অনৈসলামী মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে আনে এবং তাকে ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বান জানায়। আবার ইসলামী কবিতা ও গল্প হচ্ছে এমন এক পর্যায়ের সাহিত্য যার পিছনে সক্রিয় চিন্তাধারা ও মন–মস্তিষ্ক ইসলামী চিন্তার সীমারেখাকে মেনে নিয়েছে এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনা, বর্ণনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম আরোপিত নৈতিক বিধি নিষেধকে নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় গণ্য করেছে। ইসলামী সাহিত্যে মানুষের সাধারণ আশা–আকাংখা এমন স্বাভাবিক পদ্ধতিতে মূর্ত হয়ে ওঠে যার ফলে তা একটি সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনের ক্ষেত্র তৈরী করে বা তাতে সহায়তা দান করে।

কোন জাতি যখন ইসলামকে তার নিজের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে তখন সে কেবল নিজের জীবনকে সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজায় না বরং সেই জীবন বিধানের সাথে তার চিন্তাগত ও আবেগময় সম্পর্ক এবং মানব জাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি তাকে আল্লার এই অফুরন্ত অনুগ্রহটি অন্যের নিকট পৌছিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মনে আকাংখা জাগে, দীনের যে অন্তহীন কল্যাণের সাগরে সে অবগাহন করেছে অন্যরাও তার স্বাদ অন্তত কিছুটা হলেও আস্বাদন করুক। টলষ্টয়, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, ইলিয়ট, বার্ণাড'শ তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের অনুভূতি ও মতবাদ যদি তার যথার্থ স্বাভাবিক কাঠামোয় পাঠকের দ্বারে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হন তাহলে সাদী, ইকবাল, ফররুখ সক্ষম নন কেন? ইকবাল তো ইসলামের সমগ্র চিন্তা দর্শনকে কবিতার নরোম আবরণে ঢেকে বিশ্ব মানবতার দরবারে পৌছিয়ে দিয়েছেন। কোনো অনুভূতিশীল মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়ার সফল প্রকাশের নাম যদি আর্ট হয়ে থাকে, তাহলে একজন ভালো মুসলিম একজন ভালো আর্টিষ্ট বা ভালো সাহিত্যিক (যেহেতু সাহিত্য আর্টেরই একটি অঙ্গ) হতে পারবে না কেন? বরং এক জন মুসলিম

সাহিত্যিক আন্তরিকতা ও হৃদয়ানুভূতির দিক দিয়ে সবার উর্ধ্বে স্থান পাবার যোগ্য। কারণ আল্লাহ ভীতি তার হৃদয়ের তারগুলোকে এত বেশী সংবেদনশীল বানিয়ে দেয় যার ফলে মানুষের সামান্যতম দুঃখ বেদনা তার মনে দোলা লাগাবার জন্য যথেষ্ট হয়। সে কেবল উপমা-উৎপ্রেক্ষার তেলেসমাতি দেখিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করে না বরং তার সাহিত্য হয় যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দাম সঙ্গীতের মতো, রক্তের প্রতিটি কণায় তা প্রচন্ড আলোড়ন তোলে। মানুষকে জীবনের গতিশীলতার সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়। ইকবালের কথায়-

"তু রাহে না ওয়ারদে শওক হ্যায় মনযিল না কর কবুল
লায়লা ভী হামনাশীঁ হো তো মাহমিল না কর কবূল।"

প্রেম পথের পথিক তুমি?
কোনো মনযিলে নিয়োনা বিশ্রাম
লায়লা তোমার পার্শ্বচরী হলেও
উটের হাওদায় করোনা আরাম।

তার কলম কেবল আনন্দের গীত গায়না বরং একই সংগে গায় জাগরণী সংগীত, যা মানুষের ভেতরের ঘুমন্ত মানবতাকে জাগিয়ে তোলে। সে নিজের সমালোচনা শক্তির সাহায্যে একজন অভিজ্ঞ সার্জনের মতো সমাজ দেহের অসুস্থতার মূল কেন্দ্রে হাত রাখে, অত্যন্ত সতর্কতা ও আন্তরিকতার সাথে ফোড়া টিপে টিপে তার সব পুঁজ বের করে দেয় এবং এভাবে সমগ্র সমাজ দেহের রক্ত পরিশুদ্ধ করে।

ইসলামী সাহিত্য সমগ্র মানব জাতির কল্যাণকামী। এ সাহিত্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবরকম জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। ধনী-দরিদ্রের ওপর যে জুলুম করে, শক্তিশালী দুর্বলের ওপর যে নির্যাতন চালায়, মালিক শ্রমিককে উৎপীড়নের যে স্টীম রোলারে পিষে স্তব্ধ করতে চায়, সাদারা কালোদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ অভিযান চালায়, সমাজ ব্যক্তির ওপর এবং ব্যক্তি সমাজের ওপর যে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে-এ সাহিত্য সে সবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে।

ইসলাম কোনো স্থবির আকীদা বিশ্বাস ও নিষ্প্রাণ ধর্ম নয়। বরং একটি

জীবন্ত ও গতিশীল জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সমস্ত বিভাগে ইসলাম নেতৃত্ব দেয়। বস্তুবাদী জীবন মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও হিংস্রতার জন্ম দিয়েছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কাঠামো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ঈমানের স্ফুলিংগ স্তিমিত হয়ে গেছে। আল্লাহ প্রেমের আগুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মানবতা আজ একরাশ ছাই ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আজ এমন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী অনুভূত হচ্ছে, যার ভিত্তি আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে তা উন্নত চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত হবে আবার অন্য দিকে তাতে থাকবে ঈমান ও প্রত্যয়েরউষ্ণতা।

একজন ইসলামী সাহিত্যিক কোন্ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে তার সাহিত্যের প্রাসাদ গড়ে তুলবে? এটা একটা বিচার্য বিষয়। ইসলামী সাহিত্যিক একদিকে যেমন ইসলামের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী হবে তেমনি অন্যদিকে হবে পুরোপুরি সমাজ সচেতন। মানুষের ও মানুষের সমাজের সমস্যাগুলো সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে। মানবতার কল্যাণাকাংখা তার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে অনুরণিত হবে। এজন্য যে বিষয়বস্তুগুলোকে সে তার কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ছড়িযে দেবে সেগুলো হচ্ছেঃ

এক ঃ ইসলামের তিনটি মৌলিক বিশ্বাস–তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। এ তিনটি বিষয়বস্তুকে কবিতায়–গল্পে–উপন্যাসে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা সমগ্র পরিবেশকে প্রভাবিত করে। এজন্য অবশ্যি একজন ইসলামী কবি ও ইসলামী গল্পকারকে তার পরিবেশ ও সমাজ চিন্তার কাঠামোর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে। এ মৌলিক বিশ্বাস তিনটিকে একটি বিশ্বজনীন জীবন দর্শনের চিন্তাগত ভিত্তি হিসাবে পেশ করতে হবে। এ তিনটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিবেশের ধারা ও ঘটনার মোড় পরিবর্তন করতে হবে।

দুই ঃ ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলী। ইসলামী কবি ও গল্পকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপনার মাধ্যমে তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিক গুণাবলী ও বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন। অন্যদিকে বর্তমান নৈতিকতা বিগর্হিত পরিবেশ ও অসুস্থ সমাজ চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করবেন। এ সংগে ইসলামের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর আলো জ্বালিয়ে

সমগ্র সমাজ অংগনকে আলোকিত করবেন। উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল। ইসলামী সাহিত্যিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজদেহে এই গুণাবলীকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

তিন : আমাদের সমাজ পরিবেশ। প্রথমে দেশের সমাজ পরিবেশ। পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সমাজ পরিবেশ। এছাড়াও মানসিক ও চিন্তাগত এবং নৈতিক পরিবেশ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। সব রকমের পরিবেশ। এসব পরিবেশ আমাদের প্রতিকূল। এদের সাথে আমাদের চিন্তাগত বিরোধ সুস্পষ্ট। কাজেই এই বিরোধীয় পরিবেশ ও তার কাঠামোয় প্রচন্ড আঘাত হানতেহবে। নতুন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সাহিত্যের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে।

চার : আমাদের চতুর্থ বিষয়বস্তু হচ্ছে নারী। এর কারণ হচ্ছে, বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় নারীকে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করছে আমরা তা থেকে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে এবং ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চাই। নারীকে গৃহের ও পরিবারের মধ্যমনি বানিয়ে আমরা যে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও পরিবারে শান্তির নীড় রচনা করতে চাই, আমাদের কবিতায় ও গল্পে একদিকে যেমন তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে তেমনি অন্য দিকে পাশ্চাত্য সমাজ নারীকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে এনে তাকে পুরুসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে ঠেলে দিয়ে যে সমাজ গড়ে তুলেছে তার ক্ষতি, বিপর্যয়, বৈপরীত্য ও ধ্বংসের চিত্রও তাতে ফুটে উঠবে।

পাঁচ : আমাদের পঞ্চম বিষয়বস্তু হচ্ছে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম। আধুনিক জাহেলিয়াতের এ দুটি সন্তান আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও যে ধ্বংস ডেকে আনছে তার প্রত্যেকটা পর্যায় আমাদের জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। বিশেষ করে কমিউনিজম বিপ্লব আনার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার সাথে আমাদের সুস্পষ্ট বিরোধ। ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলমানদের সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য আমাদের এ বিষয়বস্তুটি অবলম্বন করতে হবে। এই সংগে দারিদ্র ও শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হতে হবে বিরামহীন।

ছয় ঃ দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচার। একদিকে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলামী সাহিত্য হবে সোচ্চার তেমনি অন্যদিকে ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচারের দৃষ্টান্তও তুলে ধরতে হবে।

সাত ঃ আমাদের সপ্তম বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লব। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটিই হবে আমাদের সবচাইতে আবেগময় বিষয়বস্তু। ইসলাম একটা আন্দোলন এবং ইসলামী সাহিত্য এ আন্দোলনের ফসল। মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্য এ আন্দোলনের মূল চিন্তাধারা ও পদ্ধতি তাদের সামনে তুলে ধরা তাই এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব

সাহিত্যিক সমাজ থেকে আলাদা কোনো সত্তার নাম নয়। বরং তিনি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে অনুভূতিশীল সদস্য। ইসলামী সাহিত্যিক যেমন ইসলামী সমাজের সবচেয়ে অনুভূতিশীল প্রতিনিধি তেমনি তার সাহিত্যে ইসলামী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। ইসলাম তার সদস্যদের ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ইসলামী সাহিত্যিককে তা থেকে অব্যাহতি দেয়নি।

ইসলাম তার বিধানের প্রতি আনুগত্যকে শুধু মুসলমানদের নিজের সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। সারা দুনিয়ার মানুষকে ইসলামী বিধান মেনে চলার জন্য আহ্বান জানানোর দায়িত্বও মুসলমানের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। মুসলমান নিজে ভালো কাজ করবে এবং অন্যকেও করতে উদ্বুদ্ধ করবে। নিজে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে এবং অন্যকেও দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে মুসলমান সারা দুনিয়ার মানুষকে ভালো কাজ করার ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। মুসলিম সাহিত্যিক যে সাহিত্য সৃষ্টি করবে তা একদিকে সমাজে ন্যায়, কল্যাণ ও সৎবৃত্তির প্রসার ঘটাবে এবং অন্যদিকে অসৎবৃত্তি, অন্যায় ও অকল্যাণের স্পর্শ থেকে সমাজকে দূরে রাখবে। তাই এই ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সৎ ও অসৎ, কল্যাণ ও অকল্যাণের

মানদন্ড কি হবে? এগুলো কি কোন আপেক্ষিক বিষয়? কুরআন এগুলোর যে মানদন্ড দিয়েছে মুসলিম সাহিত্যিকের জন্য একমাত্র সেই মানদন্ডই গ্রহণীয় হবে। ভালো ও মন্দ, হালাল ও হারামের নীতি কুরআন ও হাদীসই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে এবং তাই হবে একমাত্র গ্রহণীয় নীতি। নিজের জন্য যা ভালো বা মন্দ, পরিবারের জন্য যা ভালো বা মন্দ, সমাজের, জাতির ও দেশের জন্য যা ভালো বা মন্দ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই ভাল বা মন্দ। এক অবস্থায় এক পরিবেশে যা ভালো অন্য অবস্থায় অন্য পরিবেশে তা মন্দ আবার এক সময় যা ভালো অন্য সময় তা মন্দ–ভালো মন্দ সম্পর্কে এই যে ধারণা এটা ইসলামী মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই একজন মুসলিম কবি ও মুসলিম গল্পকার ভালো ও মন্দের যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের মূলনীতির বাইরে অবস্থান করতে পারেন না। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সৎবৃত্তি ও কল্যাণের প্রসারে এবং কুরআন হাদীসে বর্ণিত অসৎবৃত্তি ও অকল্যাণকে সমাজের বুক থেকে চিরতরে উৎখাত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন।

কুরআনে এই ভালো ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায়কে বুঝাবার জন্য "মারূফ" ও "মুনকার" এর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত্ লিন্নাস, তা'মুরুনা বিল মা'রূফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার– "তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী, কারণ তোমাদের উত্থিত করা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।"

কুরআনের এক স্থানে যথার্থ সৎবৃত্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "আসল সৎবৃত্তির অধিকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লার ওপর, আখেরাতের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লার কিতাবের ওপর এবং পয়গম্বরদের ওপর ঈমান আনে আর আল্লার প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন সম্পদ আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতিম, গরীব, মুসাফির ও প্রার্থীদের জন্য ব্যয় করে, নামাজ পড়ে, যাকাত দেয়, নিজের ওয়াদা পালন করে এবং বিপদ, যুদ্ধ ও কঠিন সময়ে অবিচল থাকে।"

"মুমিন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না, ব্যভিচার করে না, মিথ্যা সাক্ষ দেয় না এবং যেখানে কোনো আজে বাজে কাজ হতে থাকে সেখান

থেকে ভদ্রভাবে চলে যায়।"

দুনিয়ার প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে তার অনুসারীদের মধ্যে সাহসিকতা ও শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের অনুভূতি সৃষ্টির পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম শক্তিকে খারাপ জিনিস গন্য করে কিভাবে শক্তির হ্রাস ও বিলোপ সাধন করা যায় এ জন্য কঠোর সাধনা করেছে। কিন্তু কুরআন মুসলমানদের এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, শক্তি আসলে কোনো খারাপ জিনিস নয়, তবে অনেক খারাপ জায়গায় ও খারাপ ভাবে তা ব্যবহার করা হয়। শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে হক্‌কে প্রতিষ্ঠিত করার এবং বাতিলকে খতম করার জন্য। সৎ লোকদের হাতে যদি শক্তি না থাকে তাহলে তারা অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, অবিচার বন্ধ করবে কিভাবে? এ শক্তি না থাকলে তারা বাতিলের মোকাবিলা করবে কিভাবে এবং কিভাবে জিহাদ করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবে? তাই কুরআনের বহু জায়গায় শক্তি সঞ্চয় করে বাতিলের সাথে জিহাদ করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

"নিজেদের শক্তি–সামর্থ ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখো। এর সাহায্যে আল্লার দুশমনদের এবং যাদের তোমরা জাননা তাদের ভীত করতে পারবে।"

"হে ঈমানদারগণ। যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মোকাবিলা করতে থাকো তখন পিছে হটোনা। আর যে সেদিন যুদ্ধের কোনো কৌশল হিসাবে অথবা মুসলমানদের কোনো বাহিনীর সাথে মিলে যাওয়ার জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে পিছে হটবে সে আল্লার গযব লাভের অধিকারী হবে এবং তার স্থান হবে জাহান্নামে।"

মুনাফিকদের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

"বিপদের সময় উপস্থিত হলে তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখো, তারা কেমন আতংকগ্রস্তের মতো তোমাদের দিকে চেয়ে আছে, তাদের চোখগুলো এমনভাবে ঘুরছে যেন তাদের ওপর মৃত্যুর বিভীষিকা ছেয়ে গেছে।"

"যখন এমন কোনো আয়াত নাযিল হয় যার মধ্যে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে তখন যাদের হৃদয় রোগগ্রস্থ তাদের তোমরা দেখবে, তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মৃত্যু বিভীষিকায় তারা বেহুশ হয়ে গেছে।"

অন্যদিকে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রসংগে বলা হয়েছেঃ

"হে নবী! মুমিনদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করো।"

"যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে নাও।"

"আল্লাহ মুমিনদের ধন-প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।"

"যারা আল্লার পথে মারা গেছে তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত।"

অনেক স্থানে আমাদের বদ অভ্যাসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলোর হাত থেকে আমাদের চরিত্রকে মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। হয়তো দ্বিতীয় পক্ষ তোমাদের চেয়ে ভালো হবে... ... কাউকে খোঁটা দিয়ো না এবং বিকৃত নামে স্মরণ করো না।"

"হে ঈমানদারগণ! বেশী বেশী অনুমানমূলক ধারণা থেকে দূরে থাকো। অনেক অনুমানমূলক ধারণা মূর্তিমান গোনাহের রূপ নেয়। আর আড়ি পেতোনা এবং পরস্পরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?"

কুরআন মুসলমানদের মধ্যে কোন্ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে এবং তাদের চরিত্রে কোন্ ধরনের নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ দেখতে চায়, উপরের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আয়াতের উপস্থাপনা থেকে তা মনে হয় বেশ কিছুটা সুস্পষ্ট হয়েছে। মুসলমানদের কার্যাবলী যাচাই করার মানদন্ড কি হবে, সমাজে কোন ধরনের নীতি ও আচার-আচরণ সম্প্রসারণের সুযোগ দেয়া হবে, কোন আবেগঅনুভূতি সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, কোন ধরনের অসৎবৃত্তি থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে হবে- এসব কিছু সম্পর্কে আমরা এ আয়াতগুলো থেকে দিক নির্দেশ পেতে পারি।

কাজেই এক কথায় বলা যায়, ইসলাম আমাদের যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো দান করেছে সেগুলোই হবে আমাদের ইসলামী সাহিত্যের মূল ভিত্তি আর এখান থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল গাইড বুক হচ্ছে কুরআন।

ইসলামী সাহিত্যিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তিসত্তা নয়। মুসলিম সমাজে যে অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজ করে একজন ইসলামী সাহিত্যিক সেই সমাজেরই চিত্রকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করে। কিন্তু মুসলিম সমাজ সব

সময় আদর্শ হয় না। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ হয় মুসলিম সমাজের আদর্শ। এই আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছার জন্য সে চেষ্টা করতে থাকে। তার এই প্রচেষ্টায় ইসলামী সাহিত্যিক সহায়তা দান করে। ইসলামী সাহিত্যিক মুসলিম সমাজের এমন কোনো চিত্র রূপায়িত করতে পারে না যা ইসলামী সমাজের মান আরো নামিয়ে দেয়। তবে সমাজ পরিবর্তন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন কোনো চিত্র অবশ্যি সে অংকন করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্যিক তার হৃদয়ের দরদ ও আন্তরিকতা দিয়ে গলদগুলো অনুভব করে। গলদের চিত্র অংকন করার সময় তার মনে একটুও আনন্দের দোলা লাগে না। তার কণ্ঠে হতাশার সুর শ্রুত হয় না। আর বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর থেকে তো সে অবস্থান করে শত শত কিলোমিটার দূরে।

ইসলামি সাহিত্যে প্রেম প্রসংগ

একটি ছেলে একটি মেয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমন তাদের দু'জনের চিন্তার ঐক্য, কথা বলার শালীনতা যা হৃদয় স্পর্শ করে , চরিত্র মাধুর্য, দৈহিক সৌন্দর্য ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ মনস্তত্ত্ববিদের মতে যৌবনের স্বাভাবিক কামনা তাদের এই পারস্পরিক আকর্ষণের প্রধানতম কারণ। যদিও সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে তাকে দাবিয়ে দিতে হয়। আর কোন কোন কামনাকে দাবিয়ে দেয়া এবং কোন কোন আকাংখাকে অপূর্ণ রাখা এমন কোন মারাত্মক ব্যাপার নয়, যেমন অনেকে মনে করে থাকেন। আসলে জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন হয়। অনেক সময় জীবনের স্বার্থেই আমাদের অনেক কামনা বাসনা, আশা-আকাংখা পরিহার করতে হয়। এর ফলে বাড়াবাড়ি থেকে আমরা বেঁচে যাই। আর সমাজ জীবনে কোন এক ব্যক্তির সব বাসনা পূর্ণ হওয়া বা একটি বাসনার সীমাহীন চাহিদা পূরণ হওয়া কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আকাংখা পূরণের কোন একটি

সীমা থাকতে হবে। এই নির্ধারিত সীমারেখাটি ঐ ব্যক্তির জন্য যেমনি, তেমনি সমাজের জন্যও কল্যানকর। কারণ, যদি এক ব্যক্তি তার আকাংখাকে লাগামহীন রাখার দাবী পোষণ করে তাহলে তাকে অন্যদের এ দাবী মেনে নিতে হবে। আর যদি প্রত্যেকের এ দাবী মেনে নিতে হয় তাহলে কেউ কি নিজের উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী নিজের আকাংখা পূর্ণ করতে পারবে? কারণ এখানে একজনের আকাংখা পূরণ অন্যের বঞ্চনার কারণ হবে। ফলে বিরোধিতা ও সংঘর্ষ দেখা দেবে ব্যাপক হারে। মনস্তত্ত্ববিদদের অনেকেই বিশেষ করে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুসারীগণ এই কামনা ও আকাংখাকে দাবিয়ে দেবার অনিবার্য পরিণতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন। আমার মতে এ ব্যাপারে তাঁরা খুব বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। মানুষের স্বভাব ও মেজাজকে তারা কাঁচের পেয়ালার মতো ঠুনকো মনে করেছেন, পড়লেই ভেঙ্গে যাবে এবং এমনভাবে ভেঙ্গে যাবে যে তা আর জোড়া লাগানো যাবে না। মানুষের কোন কামনায় আঘাত লাগলেই তার মেজাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, মানে তা একেবারে বিগড়ে যায়, একথা পুরোপুরি সত্য নয়। মানুষের মেজাজ অনুধাবন করার ব্যাপারে এখানে একটি মৌলিক ভুল করা হচ্ছে। যে মহান পরাক্রমশালী সত্তা আমাদের জীবন এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে একজনের কামনা পূরণ ডেকে আনে অন্যজনের বঞ্চনার অনিবার্য পরিণতি, তিনিই মানুষকে তার কামনা পূর্ণ না হওয়ার ও আকাংখার বঞ্চনার জন্য সবর করার শিক্ষাও দিয়েছেন। আর এটিই ছিল ইনসাফের দাবী। নয়তো জীবন হয়ে পড়তো একটা বিরাট বোঝা। কালের প্রবাহে বড় বড় আঘাতের দাগও মুছে যায়। কঠিন শোকাবহ ঘটনা যা হৃদয়ের পরতে পরতে অসহনীয় বেদনার রেশ ছড়িয়ে দিয়েছিল তাও একদিন মানুষ ভুলে যায়। প্রত্যেক দুর্ঘটনার কিছুদিন পর মানুষ আবার জীবনের পথে চলতে থাকে। আবার আশা আনন্দ নরোম নরোম পা ফেলে নিশব্দে তার জীবন আঙিনায় প্রবেশ করে। জীবনের যে সব কলি শুকিয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার তরতাজা হয়ে ওঠে। হাসি-আনন্দে আবার তার জীবন ভরে ওঠে। পেছনের দুর্ঘটনার শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে যায়।

কাম শক্তিকে কয়েক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক, সাময়িক সুখ ও তাৎক্ষণিক আনন্দ লাভ করার জন্য চোখ বন্ধ করে যেখানে

ইচ্ছা ও যেভাবে ইচ্ছা একে ব্যবহার করা যায়। এভাবে এর ভান্ডার শূন্য করে দেয়া যায়। এর ব্যবহারের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, এর ভান্ডার থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু শক্তি নিয়ে বংশ রক্ষার কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। আর বাদবাকী শক্তি জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যেতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদগণ একে Sublimation বা উর্ধ্বপাতন নাম দিয়েছেন অর্থাৎ তরল পদার্থকে উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পীভূত করে পুণরায় তাকে তরল করা। মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে কামশক্তিকে জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা এমন একটা ভান্ডার যার সাহায্যে কেবল বংশ রক্ষা, বংশ বৃদ্ধি বা যৌন পরিতৃপ্তি লাভই নয়, জীবনের আরো বহু প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা দু'টি যুবক যুবতীর বৈধ প্রেমকে অন্যায় গণ্য করতে পারি না। তবে সে প্রেমকে অবশ্যি নৈতিকতার সীমানার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। যেমন একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসতে পারে তার দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যের জন্য, তার চারিত্র মাধুর্য এবং চিন্তা ও ভাবধারার ভারসাম্য ও একাত্মতার জন্য। তার এই ভালোবাসা বৈধ পথে অগ্রসর হয়ে তাকে লাভ করে নিজের জীবন সঙ্গিনী বানাবার জন্য বৈধ প্রচেষ্টা চালাবার সব রকমের অধিকার রাখে। হয়ত এই ধরনের ভালোবাসা তাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়ে দিতেও সাহায্য করতে পারে। যদি তার প্রেমিকা উন্নত জাগতিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় তাহলে নিজেকে তার যোগ্য প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য নিশ্চিত ভাবেই সে নিজেও সমপর্যায়ের উন্নত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যি গোপনে বা প্রকাশ্যে প্রেম চর্চা করার অনুমতি তাকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ এর ফলে বিপর্যয় ও অনর্থ সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। দ্বিতীয়ত তার প্রেমিকাকে লাভ করার আকাংখা যেন এমন পর্যায়ে পৌছে না যায় যার ফলে প্রেমিকাকে লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে সে আত্মহত্যা করতে বসে অথবা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে দেওয়ানায় পরিণত হয়। কারণ এখানে পৌছেই ভারসাম্য শেষ হয়ে যায়। এর পর থেকে শুরু হয় প্রান্তিকতার পথ। আর ইসলাম ভারসাম্যকেই ভালো পথ বলে ঘোষণা করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ খাইরুল উমূরি আওসাতুহা– "দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী পথটিই ভালো।" এছাড়াও এখানে

এসে একথা চিন্তা করতে হবে যে, বহু রকমের নৈতিক ও সামাজিক নীতির কারণে আমরা অনেক সময় নিজেদের আকাংখা ও কামনা-বাসনা ত্যাগ করে থাকি, তাহলে এক্ষেত্রে কামনাটি এতো বেশী গুরুত্ব লাভ করলো কেন যে, এর ব্যর্থতার ফলে আমাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমরা জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবো? অথচ আমরা জানিনা ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে। যার জন্য আমরা আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হচ্ছি সে জিনিসটি আগামীকাল আমাদের জন্য কল্যাণ না অকল্যাণ ডেকে আনবে তাও আমরা জানিনা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি বড়ই আশা করে আমরা কোন জিনিস গ্রহণ করি কিন্তু পরে সেটি আমাদের বিরাট ক্ষতি করে। তখন আমরা আল্লার কাছে দোয়া করতে থাকি, হে আল্লাহ! এর হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। এটিকে কুরআনে এভাবে বলা হয়েছেঃ আসা আন তাক্‌রিহু শাইয়ান ওয়া হুয়া খাইরুল লাকুম ওয়া আসা আন তুহিব্বু শাইয়ান ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম- "হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর আবার একটি জিনিসকে তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করো অথচ সেটা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"

এ ধরনের আয়াতে আবেগের ভিত্তিতে যে সব কাজ করা হয় এবং যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার ওপর চূড়ান্ত লাভ ক্ষতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম যে স্বভাবধর্ম এবং মানব প্রকৃতির সব রকমের দুর্বলতা ও মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রতি যে তার পূর্ণ নজর রয়েছে তাও এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, মানুষের প্রেমে পাগল হয়ে যাওয়ার কোন স্বীকৃতিই ইসলামে নেই।

তবে এই সংগে একথাও সুস্পষ্ট যে, নৈতিকতার সীমানায় অবস্থান করে কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা যাবে না বরং তাকে ভালো বলা যাবে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আমি মেয়েদের সৃষ্টি করেছি যাতে তাদের মাধ্যমে তোমরা মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারো।" আর কোনো বিবেকবান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারবে না। একজন সদাচারিণী মহিলা একজন পুরুষের হৃদয়কে পরিপূর্ণ শান্তির সাগরে অবগাহন করাতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ার কোন সম্পদ এই মানসিক প্রশান্তির বিনিময় হতে পারে না একথা সবাই জানে। শুধু এখানেই

শেষ নয়, কুরআনের বর্ণনা মতে সদাচারিণী স্ত্রীরা জান্নাতেও স্বামীদের সাথে থাকবে। অর্থাৎ সদাচার কেবল দুনিয়ায় তাদের একত্রিত হয়ে যাওয়ার ভিত্তি হয়নি, আখেরাতে তাদের এক সাথে জীবন অতিবাহিত করারও ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নৈতিকতার সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ভালোবাসা যদি যথার্থ সদাচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রসর হয় তাহলে তা চিরন্তন হতে পারে।

ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম, তাই তার সামাজিক আইনে প্রেম প্রবণতার পরিতৃপ্তির পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন পুরুষ কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে। বৈধ পদ্ধতিতে তাকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করতে পারে। ইসলাম স্ত্রীর সাথে ভালো সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কেবল হুকুমই দেয়নি বরং একে ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। বিপরীত পক্ষে খৃষ্টধর্মে নারী সত্তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে বলা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে "পাপের পুত্তলী" তার সাথে সম্পর্ক রাখাকেও পাপ বলা হয়েছে।

এই অস্বাভাবিক নীতির যে পরিণতি আমরা দেখেছি তা হচ্ছে, এই নীতি নির্দেশকারীগণ এবং বাহ্যত এ নীতি বাস্তবায়নকারী গোষ্ঠী পাদরী ও যাজকগণ সবচাইতে বেশী কামপ্রবণতার শিকারে পরিণত হয়েছেন। পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানী লেকেভ (LECKEV) তাঁর ইউরোপীয় নৈতিকতার ইতিহাস" (HISTORY OF EUROPEAN MORALS-VOLII) গ্রন্থে লিখেছেনঃ "মধ্যযুগে ব্যভিচার মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাদরীরা প্রকাশ্যে নিজেদের মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখতেন। পাদরীদের বিয়ে না করার রেওয়াজ ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠছিল। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের ব্যভিচার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের আমল তাদের আকিদার সাথে সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়নি।" বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর "বিয়ে ও নৈতিকতা" (MARRIAGE AND MORALS) গ্রন্থে লিখেছেনঃ "মধ্যযুগের ইতিহাসবেত্তাগণের অধিকাংশই গীর্জার মধ্যে পাদরীদের এমন সব কক্ষের উল্লেখ করেছেন যেগুলো আসলে ছিল ব্যভিচারের আড্ডাখানা। এই কক্ষগুলোর চার দেয়ালের মধ্যে অসংখ্য নিষ্পাপ মানব শিশুর প্রাণনাশ করা হয়েছিল। বারবার নির্দেশ দেয়া হতো, পাদরীরা যেন তাদের মা বোনদের সাথে অবস্থান না করে। কিন্তু এ নির্দেশের কোন বাস্তব প্রভাব পড়তো না।"

এরপর আসে সেই প্রেমের কথা– নিছক দু'টি যুবক যুবতীর দৈহিক কামনার মধ্যেই যার অবস্থান। এটা আসলে একটি যৌন কামনা ও যৌন উপভোগ এবং নেহাত স্বার্থবাদিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্যে একে খামখা প্রেম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আসলে উঠতি বয়স ও যৌবন এমন একটি সময় যা ছেলেমেয়েদের জীবন–চরিত্র গঠনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় একবার যদি তারা ভুল পথে পা বাড়ায় তাহলে সারাজীবন অনুশোচনা করা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ থাকে না। অনভিজ্ঞতার কারণে তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও ভুল পথে এগিয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ছেলেমেয়েদের তাদের নৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে এবং জীবনের এই সংকটকালে এবং সবচাইতে জটিল পরিস্থিতিতে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্য তাদের এই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা

অশ্লীলতা শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, প্রকাশভঙ্গীতেও। অশ্লীলতা আকারে–ইংগিতে। বিষয়বস্তুর প্রাথমিক স্তর বিন্যাসে। ইসলামী সাহিত্যের কোনো ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েও অশ্লীলতার প্রতি সমর্থন নেই। অশ্লীলতা হচ্ছে একটা বিকৃত রুচি। আর এই বিকৃত রুচির সাথে ইসলামী সাহিত্যিকের হৃদ্যতা কেমন করে বাড়তে পারে? "বুঈসতু লিউতাম্মিমা মাকা–রিমাল আখলা–ক" –আমাদের নবীকে যেখানে আমাদের চরিত্রে নৈতিক দিকগুলোকে আরো বেশী শালীন, আরো বেশী রুচিশীল ও আরো বেশী পূর্ণতা দান করার জন্য পাঠানো হয়েছিল সেখানে আমরা কেমন করে অশালীন পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিতে পারি। কুরআনে মুমিনের রুচিবোধ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "ওয়া ইযা মাররু বিল লাগবি মাররু কিরা–মা" –যখন তারা কোন বাজে বা

অশালীন কাজের কাছ দিয়ে যায়, তখন তার প্রতি কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ না করে একান্ত অনীহা দেখিয়ে ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে। রসিয়ে রসিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এটাকে বর্ণনা করা কোন মুসলিম সাহিত্যিকের কাজ হতে পারে না।

সাহিত্যে যৌনতা প্রসংগে এই একই কথাই বলা যায়। স্বামী স্ত্রীর গোপন বিষয় তৃতীয় ব্যক্তির সামনে বলা নবী করিম (স.) নিষিদ্ধ করেছেন। আসলে এটা সাহিত্যের বিষয় নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে একে টেনে এনে সাহিত্যের কোন উন্নতি সাধন করা হয়নি এবং এ ধরনের কোন সাহিত্যের কল্যাণকামী চরিত্র থাকতে পারে না। এ ধরনের সাহিত্য চরিত্র ক্ষয়, চরিত্র নাশ ও চরিত্র ধ্বংসই করতে পারে শুধু। কাজেই ইসলামী সাহিত্যের সাথে এর দূরবর্তী কোন সম্পর্কও থাকতে পারে না।

অশ্লীলতা ও যৌন প্রসংগকে যারা সাহিত্যের আওতাভুক্ত করেন জীবন সম্পর্কে আসলে তাদের দৃষ্টিভংগীও আলাদা। মানুষকে ও মানুষের জীবনকে তারা যে দৃষ্টিতে বিচার করেন ইসলামের সাথে তার বিরোধ সুস্পষ্ট। ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে মানুষকে তারা দেখেন একটি যৌন জীব হিসাবে। মানুষ ও পশুর মধ্যে এক্ষেত্রে তারা কোন পার্থক্যই করেন না। আর জীবনকে তারা শুধু উপভোগ করার কথাই চিন্তা করেন। জীবন ও যৌবন তাদের কাছে একটি সম্পদ। এজন্য দুনিয়ায় যতদিন থাকা যায় ততদিন এই সম্পদ দু'টো উপভোগ করার জন্য তারা হাজারো পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। ধর্ম তাদের জীবন চিন্তায় পংগুত্ব বরণ করার এবং আখেরাতের জীবন সম্পর্কে সংশয় জাগার পরই তারা এই নতুন ভোগবাদী জীবন দর্শন রচনা করেছেন।

এই জীবন দর্শনের সাথে ইসলামের বিরোধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলাম জীবন ও যৌবনকে একটি মূল্যবান সম্পদ মনে করে এজন্য যে, এটি আল্লার একটি আমানত। এর মধ্যে বেঁচে থাকার ও বংশ রক্ষার একটা তাগিদ রয়েছে। কিন্তু যে তাগিদটি এর সমগ্র সত্তাকে ঘিরে রেখেছে সেটি হচ্ছে আল্লার আনুগত্যে একে পুরোপুরি সোপর্দ করা। এমনকি বেঁচে থাকার ও বংশ রক্ষার তাগিদটিও এই দ্বিতীয় তাগিদটির আওতাধীন থাকবে। কাজেই এখানে পাশবিক জীবন উপভোগের কোন অবকাশ নেই। জীবন ও যৌবনের মানবিক ব্যবহারকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সমগ্র মানব জাতির জন্য জীবন

ও যৌবনের এই ব্যবহারকেই ইসলাম কল্যাণকর গণ্য করে।

কাজেই ইসলামী সাহিত্যে অশ্লীলতা ও যৌনতার প্রসঙ্গটি কোথাও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে না। এমনকি আকারে ইংগিতে অশ্লীলতা ও যৌনতার প্রকাশও শোভনীয় মনে করা হয়নি। যেমন ব্যভিচার সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে আল্লাহ বলেছেনঃ ওয়া–লা তাক্‌রাবুয যিনা ইন্নাহু কা–না ফা–হিশাতাঁও ওয়া সা–আ সাবীলা– "আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিসন্দেহে তা নির্লজ্জতা ও খারাপ পথ।" এখানে ব্যভিচারের ধারে কাছে যেতে নিষেধ করে এ কথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার করা তো দূরের কথা, ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহী করে তোলে, ব্যভিচারের আকাংখা সৃষ্টি করে, ব্যভিচারের ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগ্রত করতে পারে এমন ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ থেকে ইসলামী সাহিত্যে অশ্লীলতার সামান্য আমেজ সৃষ্টিও যে বাঞ্ছণীয় নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এতো গেলো স্বেচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীলতা ও যৌনতা সৃষ্টির প্রয়াস সম্পর্কে ইসলামী সাহিত্যের ভূমিকার কথা। তবে ঘটনার যথার্থতা ও বিপরীত পরিবেশ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অশ্লীলতার কতটুকু স্বীকৃতি বা তার কোন ধরনের প্রকাশভংগী সাহিত্যের আওতাভূক্ত, তা অবশ্যি বিচার্য বিষয়। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় শুধু গা ছুয়ে দেবার চেষ্টা করাটুকুই যথেষ্ট। গা ধরে নাড়া দিতে থাকা ইসলামী সাহিত্যের শালীনতাবোধের পরিপন্থী। এক্ষেত্রেও প্রকাশভংগী হবে সংযত। আর এই ছুয়ে দেয়া ও স্পর্শ করার ব্যাপারটারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এ প্রসংগে কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসূফ ও ইমরাআতুল আযীযের (মিসরের শাসনকর্তার স্ত্রী) দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। ইমরাআতুল আযীয ইউসূফকে ঘরের মধ্যে আটকে ফেলে যখন তার কাপড় ধরে টানতে শুরু করে দিয়েছে সে সময়কার অবস্থাটা আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ওয়া লাকাদ্ হাম্মাত্ বিহী ওয়া হাম্মা বিহা লাউলা আর্ রাআ বুরহা–না রাব্বিহ'– "সেই মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউসূফ তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না সে তার রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেতো"। মিসরের শাসনকর্তার স্ত্রীর জন্য প্রেমের এমনি আরো কিছু সংযত বর্ণনা কুরআনে পাওয়া যায়। এর সাহায্যে ঘটনার গভীরে পৌছুতে পাঠককে

একটুও বেগ পেতে হয় না।

আল্লাহ চাইলে এখানে ঘটনার পুরোপুরি একটি ছবি আঁকতে পারতেন। শাসনকর্তার স্ত্রী কি করলেন এবং ইউসূফ তার দিকে কিভাবে এগিয়ে গেলেন, যাতে বুঝা যাচ্ছিল যে তিনি তার ডাকে সাড়া দিতে চাচ্ছেন –এসব কিছুর কোন বিস্তারিত বর্ণনা এখানে করেননি। কিন্তু এমন শালীন শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে ঘটনার পুরো একটি কল্পচিত্র পাঠকের মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। অশালীন ঘটনাবলী বর্ণনার এই ইসলামী কায়দা কুরআন আমাদের শিখিয়েছে।

এই সাথে কুরআনের যুগে আরবী সাহিত্যে যৌনতা ও অশ্লীলতার চরম বিকাশের কথাটিও সামনে রাখা দরকার। তবেই কুরআনের এই সংযত প্রকাশভংগীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে এবং অশ্লীল ঘটনাবলী বর্ণনার সীমারেখাও চিহ্নিত হয়ে যাবে।

ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য

আমাদের আলোচনা থেকে ইসলামী সাহিত্যের একটা আলাদা ছবি ভেসে উঠলেও একে মুসলিম সাহিত্যের সাথে এক করে দেখার চেষ্টাও হয়তো কেউ করতে পারেন। তাই ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়াও জরুরী মনে করি।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম আসতে হয় ইসলাম ও ইসলামী সমাজের কথায়। ইসলাম ও ইসলামী সমাজ কোনো নতুন বিষয় নয়। দুনিয়ার প্রথম মানুষ ছিলেন ইসলামের অনুসারী আর প্রথম সমাজ ছিল ইসলামী সমাজ। আজকের বিশ্ব–সমাজের সর্বত্র তাই ইসলামী সমাজের অংশ রয়েছে, যে রূপে ও যে চেহারায়ই তা থাক না কেন। যুগের আবর্তনে চিন্তা–ভাবনায় পরিবর্তন এসেছে, সমাজ ব্যবস্থা বদলে গেছে। আজকের ইসলামী সমাজের সীমাবদ্ধতা দেখে তাই বলে তার ব্যাপকতর রূপকে অস্বীকার করা যায় না। এখানেই

সন্ধান পাই আমরা ইসলামী সাহিত্যের যৌক্তিকতার। ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির মাল-মসলা রয়ে গেছে মানব সমাজের সমগ্র পরিসরে। শুধু মাত্র মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়। মানব সমাজের যে যে ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের স্পর্শ রয়েছে ইসলামী সাহিত্য সেখান থেকেই তার উপাদান সংগ্রহ করে। কথাটাকে অন্যভাবেও বলা যায়। অর্থাৎ মুসলিম সাহিত্য যেখানে কেবলমাত্র মুসলমানের .সৃষ্ট সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সৃষ্ট সাহিত্য। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, কোনো অমুসলিমের হাতে সৃষ্টি হলেও তা ইসলামী সাহিত্য। কাজেই মুসলিম সাহিত্যের গন্ডি একান্তই সীমাবদ্ধ। সে তুলনায় ইসলামী সাহিত্য অনেক বেশী ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী।

দ্বিতীয়ত ইসলামী সাহিত্য একটি আদর্শ ও লক্ষ্যাভিসারী। কিন্তু মুসলিম সাহিত্যের বিশেষ কোনো আদর্শ ও লক্ষের পরোয়া নেই। অমুসলিমরা যে ঢংগে সাহিত্য চর্চা করে মুসলমানরাও সেই একই ঢংয়ে সাহিত্য চর্চা করে মুসলিম সাহিত্য গড়ে তুলতে পারে। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সে সাহিত্য ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীতধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও তা মুসলিম সাহিত্য। অর্থাৎ মুসলমানের সৃষ্ট যে কোনো ধরনের সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু মুসলমানের সৃষ্ট ইসলামী মূল্যবোধ বর্জিত কোনো সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য নামে আখ্যায়িত হতে পারে না। তাই মুসলিম সাহিত্য যেখানে একটি জাতীয় সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য হচ্ছে একটি আদর্শবাদী ও উদ্দেশ্যমুখী কিন্তু সার্বজনীন সাহিত্য।

ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা

আগেই বলেছি, ইসলামী সাহিত্য কোনো নিছক ধর্মীয় সাহিত্য নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা জাতি বিশেষের ধর্মাচরণের মধ্যে এ সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়। যে সব মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য গড়ে ওঠে সেগুলো যেমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তিও তেমনি বিশ্বজনীন। তুরস্কে

তুর্কীরা ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য গড়ে তোলে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের গড়া ইসলামী সাহিত্যের সাথে তার ব্যাপক সাযুজ্য অনুভব করে। জাপানে বা চীনে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তার মানবিক মূল্যবোধটুকুই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে কিন্তু তুর্কীর ইসলামী সাহিত্যের সবটুকুই আমাদের আপন মনে হয়।

ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার আর একটা দিক হচ্ছে, সমগ্র বিশ্ব-মানবতার জন্য এর সুস্পষ্ট আবেদন রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলো যে কোনো সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে। মানবতার কল্যাণ, সামাজিক সাম্য ও সুবিচার, সৌ-ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো সকল দেশের সকল যুগের মানব সমাজের আপন সম্পদ। এগুলো সামগ্রিকভাবে কোনো সমাজের স্বার্থবিরোধী নয়। অন্য সমাজের যে মূল্যবোধের সাথে ইসলামী সমাজের কোনো কোনো মূল্যবোধের বিরোধ দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বিচার্য হচ্ছে, ইসলামী মূল্যবোধগুলো কোথাও ব্যক্তি স্বার্থে, শ্রেণী স্বার্থে, গোষ্ঠি স্বার্থে বা জাতি স্বার্থে নির্ণীত হয়নি এবং ব্যবহৃত হচ্ছে না। কাজেই এ মূল্যবোধগুলো যে কোনো সময় যে কোন সমাজের আদর্শ হতে পারে, যদি তারা কল্যাণ ও ন্যায়নীতির স্বার্থে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়।

যেমন সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদার ব্যাপারটি ধরা যাক। ইসলামী সমাজ নারীকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে এবং গৃহের যে কেন্দ্রীয় আসনে তাকে স্থাপন করেছে সেটি তার আসল, প্রকৃতিগত ও গুণগত মর্যাদা। কোনো জাগতিক বা সংকীর্ণ স্বার্থ তাকে এ আসনে বসাবার ব্যাপারে কাজ করেনি। পৃথিবীতে মানব সমাজের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ইসলাম প্রদত্ত নারীর এ মর্যাদা ও আসনের প্রতি সামগ্রিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। বিপরীত পক্ষে বিগত তিন চারশো বছর থেকে ইউরোপ নারীকে যে আসনে বসিয়েছে তার পেছনে গোষ্ঠী স্বার্থ কাজ করছে। নারীকে পুরুষের স্বার্থের যূপকাঠে বলি দেয়া হয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে বিশৃংখলা ও অরাজকতা চরমে পৌঁছে গেছে। ইতিপূর্বে প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মিসরে, রোমে, ব্যাবিলনে, চীনে ও ভারতবর্ষে নারীদের এভাবেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সভ্যতায় তারই আধুনিক প্রকরণ চলছে। পূর্বেও যেমন ছিল তা নারীত্বের

অবমাননা, শোষণ, নির্যাতন ও নারী-প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক, তেমনি বর্তমানেও।

এক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত পাশ্চাত্য মূল্যবোধ যেখানে সমাজে অশান্তি ও সংঘর্ষের জন্ম দেয়, সেখানে ইসলামী মূল্যবোধ আনে স্বস্তি ও প্রশান্তি।

তাই সমাজে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধ বিশ্বজনীন আবেদনের অধিকারী। এভাবে এই বিশ্বজনীন আবেদনের পরিপন্থী সীমাহীন ভোগ লিপ্সার মতো মানবতা বিরোধী বা শ্রেণী সংগ্রামের মতো অমানবিক বিষয়বস্তুকেও ইসলামী সাহিত্য প্রশ্রয় দেয় না। এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা সুস্পষ্ট।

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সৃষ্ট বা ইসলামী মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল অথবা অন্যান্য ধর্ম ও জাতির মধ্যে কিছু কিছু ইসলামী মূল্যাবোধের প্রচলনের কারণে তার ভিত্তিতে সৃষ্ট সাহিত্য কর্ম অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম সাহিত্যিকের অবদান হলেও ইসলামী সাহিত্য তাকে যথাযথ গুরুত্ব ও স্বীকৃতি দিতে মোটেই দ্বিধা করে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহেলী যুগের একজন আরবীয় মুশরিক কবির-আলা মা খালাল্লাহ বাতিলু- "জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল"- লাইনটি আউড়ে বলতেন, কবি তার কবিতার এ ছত্রটিতে সত্য কথাই বলেছেন।

এ দৃষ্টিতে টলস্টয়, গ্যেটে, ইলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ বার্নার্ডশ প্রমুখ কবি ও কথাশিল্পীরা মুসলিম না হলেও তাদের সাহিত্যকর্মের একাংশের সাথে ইসলামী সাহিত্য একাত্মতা ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না।

ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন

ইসলামী দাওয়াত প্রথম দিন থেকেই সঠিক বিপ্লবের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দেয়া, কথা ও কাজের ধারা পরিবর্তন করা এবং

সমাজ কাঠামো বদলে দেয়াই হয় তার লক্ষ। সাহিত্যের যে ধারা জাহেলী যুগ থেকে চলে আসছিল ইসলাম এসে তার খোল নলচে পাল্টে দেয়। জাহেলী যুগের কবিদের সম্পর্কে কুরআনের সূরা আশ্‌শৃ'আরায় বলা হয়ঃ ওয়াশ শু'আরাউ ইয়াত্তাবিউ হুমুল গাবূন, আলাম তারা আন্নাহুম ফী কুল্লি ওয়াদিঁই ইয়াহীমূন, ওয়া আন্নাহুম ইয়াকূলূনা মা-লাইয়াফ্ আলূন- "আর কবিরা। ওদের পেছনে তো চলে পথভ্রষ্ট যারা, দেখছোনা তারা মাথা খুঁড়ে ফেরে প্রতি ময়দানে আর বলে বেড়ায় তারা যা করে না তাই।" এভাবে জাহেলী যুগের সাহিত্য চিন্তার মূলধারাকে ইসলাম ভ্রষ্টতার আঁস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। জাহেলী যুগের সাহিত্য চিন্তা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষাভিসারী ছিল না। বিভ্রান্ত চিন্তার বিভিন্ন অলিগলিতে সে চিন্তা ছুটে বেড়াতো। চিন্তার স্থিরতার মাধ্যমে জীবনকে কোনো এক লক্ষ বিন্দুতে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সেখানে নেয়া হয়নি। তাই জাহেলী যুগের কবিদের কথার ও কাজের কোনো মিল ছিল না। বড় বড় বুলি আওড়ানোই ছিল তাদের পেশা। সেই অনুযায়ী কাজ করা বা নিজেদের দাবী অনুয়ায়ী জীবন গড়ে তোলার দায়িত্বই তারা নেয়নি।

বিপরীত পক্ষে কুরআন যে সাহিত্য ভান্ডার মানুষের সামনে তুলে ধরেছে তা একটি নির্দিষ্ট লক্ষের দিকে তার অনুসারীদের এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর কুরআনের অনুসারীরা সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ে তুলে তার বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। কুরআন প্রথম পর্যায়ে ইসলামী সাহিত্যের একটি মডেল নির্দেশ করেছে। আসলে কুরআন তো কোনো সাহিত্যের বই নয়। কুরআন মানুষের জন্য একটি হেদায়েত এবং জীবন যাপনের জন্য একটি খসড়া সংবিধান। এ খসড়া সংবিধান ইসলামী সাহিত্যেরও দিক নির্দেশ করেছে। সূরা আশ শু'আরার উপরে বর্ণিত আয়াতের পরপরই বলা হয়েছেঃ ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া আমিলুস্ সা-লি-হাত্ ওয়ানতাসারু মিম বা'দি মা যুলিমূ- "তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং জুলুমের প্রতিবিধান করে।" অর্থাৎ ইসলাম এমন কাব্য-সাহিত্যের পক্ষপাতি যা ঈমানী শক্তি ও সৎ কর্মের প্রেরণায় পরিপূর্ণ এবং এই সঙ্গে মানবতাকে জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার থেকে মুক্তি দেবার জন্য লড়ে যাচ্ছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীস গ্রন্থের কবিতা অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সাহাবী শারীদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

একদিন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন বাহনের পিঠে সওয়ার ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌তের কোন কবিতা কি তোমার মনে আছে? আমি জবাব দিলামঃ হাঁ, মনে আছে। তিনি বললেনঃ পড়ো। আমি তার একটি কবিতা পড়লাম। তিনি বললেনঃ আর একটি পড়ো। আমি আর একটি পড়লাম। তিনি বললেনঃ আরো পড়ো। এমনকি এভাবে আমি তার একশোটি কবিতা পড়লাম।

অন্য কয়েকটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কবি উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌ত তার কবিতার মধ্যে মুসলিম হবার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌ত জাহেলী যুগের একজন বড় কবি ছিলেন। জাহেলীয়াতের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তার কবিতার মধ্যে তওহীদের স্বীকৃতি ও কিয়ামতের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার কবিতার মধ্যে আল্লার একজন অনুগত বান্দার কণ্ঠই অনুরণিত হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবিতা পছন্দ করেছেন ও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বারবার পড়িয়ে শুনেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, কবিতা ও সাহিত্য চর্চা যদি ইসলামী মূল্যমান, মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের অনুসারী হয় তাহলে অমুসলিম সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্ম হলেও ইসলাম তার স্বীকৃতি দেয়।

কবি লবীদের জাহেলী যুগের একটি কবিতা রসূলুল্লাহ (স) খুব বেশী পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, কবিতায় যেসব সত্য কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথাটি হচ্ছে লবীদের এই কবিতাটি। এতে বলা হয়েছেঃ 'জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল।' এ কবিতার মধ্যে একটি চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে অশ্লীল কবিতা ও ইসলামী চরিত্র হননকারী সাহিত্য চর্চাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম মুসলিম সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর (রা) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মদীনা থেকে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত আরজ নামক এক পল্লীর মধ্য দিয়ে আমরা রসলুল্লার (স) সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে এসে পড়লো এক কবি। কবি তার কবিতা পাঠ করে চলছিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ 'এই শয়তানটাকে ধরো, তোমাদের কারোর পেট

কবিতায় ভরে থাকার চাইতে পুঁজে ভরে থাকা ভালো।'

এই কবির কবিতা ছিল অশ্লীল। সমাজ দেহে দূর্গন্ধ ছড়ানো ও পচন ধরানোই ছিল তার কাজ। শেরেক ও আল্লার সার্বভৌম সত্তার প্রতি আনুগত্যহীনতাই ছিল তার মূল সুর। তাই এই ধরনের সাহিত্যচর্চাকে রসূলুল্লাহ (স) কেবল অপছন্দই করেননি, এর নিন্দা করেছেন জোরালো কণ্ঠে। এ থেকে বুঝা যায়, কোন্ ধরনের সাহিত্যচর্চা রসূলের অভিপ্রেত। একমাত্র ইসলামী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল সাহিত্যচর্চার তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আটানব্বুই হিজরীতে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) উমাইয়া আমলের তদানীন্তন সাহিত্য ধারাকে উপক্ষো করেছিলেন। তিনি খলীফা হবার পর আরব, সিরিয়া ও ইরাকের বড় বড় কবিরা তাঁর শানে কাসীদা লিখে দরবারে হাজির হন তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশায়। কিন্তু তিনি কাউকেও তাঁর কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেননি। অবশেষে মহাকবি ফরযদক সেখানে উপস্থিত হন। তিনি অপেক্ষমান কবিদের ম্লান মুখ দেখে আতংকিত হন। কিন্তু কোনোক্রমে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেন, তোমাদের ঐ 'মাদাহর' (বাদশার প্রশংসা গীতি) জন্য বায়তুল মালে একটি কানাকড়িও নির্দিষ্ট নেই। অর্থাৎ মানুষের প্রশংসা কীর্তন ও মানুষের দুর্ণাম গাইবার জন্য 'মাদাহ' ও 'হিজওয়া' এর যে সাহিত্য ধারা সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র এর পৃষ্ঠপোশকতা করতে পারে না।

ইসলামের প্রাথমিক কয়েকশো বছর ছিল যথার্থ ও আদর্শ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির যুগ। কিন্তু তখন শ্রেষ্ঠ ইসলামী প্রতিভাগুলো কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল ও ইসলামী 'ইলমের অন্যান্য শাখা প্রশাখায় সৃজনশীলতায় মগ্ন থাকেন। বলা যায়, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়নি। জাহেলী যুগের আরবী কবিতা যে মানে পৌঁছে গিয়েছিল তাকে ডিঙ্গিয়ে নতুন ধারায় কবিতা সৃষ্টি চাট্টিখানি কথা ছিল না। যে কারণে সাবা মু'আল্লাকার (আরবের জাহেলী যুগের সাতজন শ্রেষ্ঠ কবি) অন্যতম কবি লবিদ (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেনঃ কুরআনের সামনে কবিতা লিখতে আমি লজ্জা অনুভব

করি। আসলে জাহেলী কবিতার মানকে পেছনে ফেলে কুরআনের মানে উত্তীর্ণ নতুন কবিতার ধারা সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ফলে দেখা যায় পরবর্তী ইসলামী যুগে যে কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে জাহেলী যুগের কাব্য ধারার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ এক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। উমাইয়া যুগ থেকেই মুসলিম আরবরা ব্যাপকভাবে আজমী সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে থাকে। এই সাথে অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্যও দেখা দেয়। ফলে আজমীদের সংস্কৃতি চর্চা, সঙ্গীত ও রাগরাগিনী আরবদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। নজ্‌দ, হিজায, সিরিয়া, ইরাক, মিসর, খোরাসান ইত্যাদি এলাকার সমস্ত বড় বড় শহরে সঙ্গীত চর্চা এবং আজমী ও জাহেলী কায়দায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যাপকতা লাভ করে। সমগ্র উমাইয়া যুগে ও আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে মুসলমানরা একটি বিজেতা জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের বিপ্লবী চেতনা অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা থেকে তারা অবস্থান করছিল অনেক দূরে। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসূল প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানরা নতুন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারা অনুযায়ী আলাদা শাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য তারা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ শাস্ত্রটিকে নতুন চেহারায় উপস্থাপন করার জন্য তারা সংগ্রাম ও সাধনা চালাচ্ছিল শত শত বছর ধরে। কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্যের চেহারাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য কোন ব্যাপকতর আন্দোলন ও প্রচেষ্টার খবর আমরা এখনো পাইনি। হযরত আলী (রা), হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুরু করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের অনেক বড় বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব কবিতা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন কিন্তু কাব্য-সাহিত্য চর্চা তাদের কাছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব লাভ করেছিল। ফলে কাব্যধারার মোড় ফিরিয়ে দেয়া এবং ইসলামী সাহিত্য চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার প্রচেষ্টা চালানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। অন্তত হযরত আলী (রা) যে ধারায় কবিতা চর্চা করেছেন তা ছিল তদানিন্তন ইসলামী সাহিত্যের একটি আদর্শ। এই ধারাটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে পরিপুষ্টি লাভ করলে ইসলামী সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল ও পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন আমাদের সামনে থাকতো।

কিন্তু তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। এই ধারাই হয়তো সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে কিন্তু দুর্বল ও ক্ষীণতর স্রোত হিসাবে, প্রবল বন্যার বেগে নয়। ফলে জাহেলী ধারার প্রবল আক্রমণে বারবার মাঝপথে এর আয়ু ফুরিয়ে গেছে।

আবদুল কাহের জুরজানী ও তাঁর মতো আরো কোনো কোনো আরবী সাহিত্য সমালোচকের মতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের সাহিত্য যথাযথ সমালোচনার অভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সাহিত্যের রূপ নিতে সক্ষম হয়নি। মোট কথা এই যুগে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় কোনো ব্যাপকতা দেখা যায়নি। যার ফলে ইসলামী সাহিত্যের কোনো সুষ্ঠু ধারা গড়ে ওঠেনি। 'তারিখুল আদাবিল আরবী'--এর লেখক ডঃ শওকী দইফ উমাইয়া যুগের আরবী সাহিত্যের ছয়টি প্রবল প্রতাপান্বিত কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কেন্দ্রগুলো হচ্ছেঃ (১) মদীনা ও মক্কা, (২) নজদ ও হিজায, (৩) কূফা ও বসরা, (৪) খোরাসান, (৫) সিরিয়া ও (৬) মিসর। পরবর্তীকালে এই কয়টি কেন্দ্র ছাড়াও আন্দালুসিয়ায় আর একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব ক'টি কেন্দ্রই জাহেলী যুগের সাহিত্য চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়নি। বরং ধীরে ধীরে ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধের বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী চিন্তাদর্শনের কাছে তারা নতি স্বীকার করেছে। আব্বাসীয় যুগের যে গল্প সাহিত্য 'আলফ্ লাইলিউ ওয়া লাই লাহ' (আরব্য রজনী) বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং এক সময় দুনিয়ার বড় বড় ভাষায় ও সাহিত্যে অনূদিত হয়ে গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছিল, তার মধ্যেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথার্থ ইসলামী মূল্যবোধের বিকৃতি দেখা যায় এবং ইসলামী সাহিত্যের মূল ভাবধারার অভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়।

পার্শ্ববর্তী ফারসী সাহিত্যে আত্তার, রুমী প্রভৃতি সূফীবাদে আক্রান্ত কবিদের কবিতায় ইসলামী সাহিত্যের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তাঁদের মধ্যে শেখ সাদীর কবিতাই সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল।

আধুনিক যুগের কবি আল্লামা ইকবাল উর্দূ ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের এমন নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন যা বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্যের বিপ্লবী চেতনাকে পরিপূর্ণ রূপ দানে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ভাবধারা যে উন্নতমানের বিশ্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম ইকবালের সাহিত্য তার প্রমাণ। ইকবাল

সাহিত্য সুফিবাদে আক্রান্ত নয় বরং ইসলামের আধ্যাত্ম চিন্তায় পরিপুষ্ট, যাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'ইহ্ সান।' হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ইহ্সানের যে চেহারা তুলে ধরেছিলেন তা হচ্ছে এইঃ "তা'বুদুল্লাহা কাআন্নাকা তারা-হু, ফাইন্ লাম তাকুন তারা-হু ফাইন্নাহু ইয়ারা-ক।' অর্থাৎ 'এমনভাবে আল্লার বন্দেগী করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে অবশ্যি তিনি তোমাকে দেখছেন।" নিজেকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যার ফলে আল্লার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। এটিই হচ্ছে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার চরমতম পর্যায়। এ পর্যায়ে আল্লাহ আল্লার জায়গায় অবস্থান করবেন এবং বান্দা বান্দার জায়গায় অবস্থান করে নিজের মধ্যে বন্দেগীর পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করবে। বান্দা নিজেকে আল্লার মধ্যে বিলীন করে দেবে না। কারণ বান্দার ব্যক্তি-সত্তা, খুদী ও অহম্-এর বিকাশই ইসলামের লক্ষ, তার বিলোপ নয়। ইকবাল সাহিত্যে এই আধ্যাত্ম দর্শনের বিকাশ ঘটেছে।

এভাবে ইকবাল ইসলামের চিন্তাধারাকে কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। প্রচলিত চিন্তা ও মতবাদের প্রতাপে তিনি কোথাও আড়ষ্ট হননি। এ ছাড়া পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি কোথাও তার বিভ্রান্তি, ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে যুগ মানসকে সতর্ক করতে ভোলেননি। কুরআন ও হাদীসের স্বচ্ছ চিন্তার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যে একটি নতুন চিন্তা জগত সৃষ্টি করেছেন। এ জগতের প্রতিটি বাসিন্দা জাগতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে সাথে পরকালীন সাফল্যের সীমান্তেও পৌছে গেছে। বাংলায় ফররুখ আহমদ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রায় তাঁরই ধারার অনুসরণ করেছেন। ফররুখ সাহিত্যে আমরা একদিকে দেখি জীবন সংগ্রাম। এই জীবন সংগ্রামের মর্দে মুমিনের আত্মা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত নয়। হতাশার বিরুদ্ধে তার জিহাদ। হতাশার সাত সাগর পাড়ি দিয়ে সে হেরার রাজ তোরণে উপনীত হবেই। অন্যায়-শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে তার জিহাদ। এই অন্যায়-জুলুমের টুটি চেপে ধরার জন্য সে উমরের মতো সিপাহসালারের অনুসন্ধান করে ফিরছে।

আধুনিক আরবী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় বেশ কিছুকাল থেকে ইসলামী

সাহিত্য আন্দোলন চলছে। বাংলা ভাষায়ও আজ এর যথার্থ সময় উপস্থিত। বাংলায় মধ্যযুগ থেকে মুসলিম সাহিত্য সাধনার যে একটা স্বতন্ত্র ধারা চলে আসছে তার মধ্যেই রয়েছে এই ইসলামী সাহিত্যের বীজ। আসলে ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেরই একটি অংশ। তাই বাংলা ভাষায় আজ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিকে একটি আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। এ আন্দোলনের মূল কথা হবেঃ

আল্লার প্রতি ঈমান

আখেরাতে বিশ্বাস ও

মানবতার কল্যাণ

এ আন্দোলনের একটি মাত্র কর্মসূচীঃ বাংলা সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধের উজ্জীবন।